সূচি

নামকরণ ১৩
বঞ্চিত স্বাধীনতা ১৪
'মুহম্মদ' জাফর ইকবাল ১৫
জাফরনামা ১৯
নাস্তিকতা কাকে বলে ২৬
নাস্তিকতা : খাঁটি-ভেজাল ২৮
সেক্টর কমান্ডার (শূন্য) পদে ... ৩০
স্যারের কাছে জিজ্ঞাসা ৩১
নাম ৩৩
নবিসম্রাট সোলায়মান ৩৯
সুশীলগিরি ৫৫
আই এ্যাম জিপিএ ফাইভ ৬৫
শিক্ষা কাকে বলে ৬৮
চেইন অব ডিমান্ড ৭২
বাঁচতে হলে জাগতে হবে ৭৭
সময়ের ওপাশে কারা ৮৪
জঙ্গিবাদ দমনে জিরো টলারেন্স ৯১
ভণ্ডবাদ নিপাত যাক ৯৬
আত্মবিস্মৃতি ১০১
সুবিধাবাদী লেখক এবং ... ১০৫
কী পড়ব কেন পড়ব ১১৪

বঞ্চিত স্বাধীনতা

‘**এবং আমি যুদ্ধে যাব**। এবার আমি যুদ্ধে যাব। যুদ্ধে আমি যাবই। যোদ্ধা আমি হবই। একদম পাক্কা...’। প্রস্তুতি সম্পন্ন। লেফট-রাইট কমপ্লিট। নজরুল, রবিদা আর হাবিব—তিন কবির কাব্য-নির্যাস থেকে মনে মনে স্বাযুসং পর্যন্ত আবিষ্কার করে ফেললেন তিনি—

লাথি মার ভাঙরে চাবি
যত সব হাবিজাবি যেতায় পাবি দে মাড়িয়ে।
আমি কি আর কারেও ডরাই,
ভাঙতে পারি মাটির কড়াই,
আসছি আমি তার আগে সব পাক হায়েনা দে তাড়িয়ে...

হারামজাদা নাপাকের দল! স্যারের রণ-প্রস্তুতির খবর শুনেই প্যান্ট ঘিলা করে ফেলল! উনার শৌর্যত্বর সামনে দাঁড়াবার সাহস না পেয়ে সুদীর্ঘ ১৩(!) দিন যুদ্ধ চালিয়ে যেতে পারলেও আর মাত্র একটা দিন মাঠে থাকবার সাহস পেল না! থাকলে তিনি দেখিয়ে দিতেন যুদ্ধ কাহাকে বলে, উহা কত প্রকার ও কী কী! আফসোস, মাত্র ১৩ দিনের জন্য স্যারের আর যুদ্ধে যাওয়া হলো না। সরি স্যার। দেশের স্বাধীনতা আপনার রণশৈলী থেকে বঞ্চিত থেকে গেল।

টীকা

স্বাযুসং=স্বাধীনতা যুদ্ধের সংগীত।
উৎসর্গ : জাফর ইকবাল স্যার
সূত্র : মুক্তিযুদ্ধের তেরো দিন
প্রকাশকাল : অমর একুশের বইমেলা ২০৪১![১]

---

[১] এই অংশের শানে নুজুল যাদের বোঝার, তাঁরা ঠিকই বুঝে নিয়েছেন। যারা বুঝেননি, জাফরনামার শেষ দিকে গিয়ে তাঁরাও বুঝে যাবেন। সমস্যা নাই।

'মুহম্মদ' জাফর ইকবাল

জি, মুহম্মদ। মুহাম্মদ বা মুহাম্মাদ নয়। তিনি তাঁর নাম এভাবেই লিখেন। হ'তে আ-কার ছাড়া। প্রশ্ন করেছিলাম এ নিয়ে। স্যার! নামটি এভাবে লিখেন কেন?

কীভাবে লিখি?

হ'তে আ-কার ছাড়া।

তাহলে কীভাবে লিখব?

'মুহাম্মদ' লিখতে পারতেন।

এভাবে কেন লিখতে হবে?

কারণ স্যার, এটি আমাদের নবিজির নাম। নামটি আরবি। হ' আরবি 'হা' অক্ষরের প্রতিনিধিত্ব করছে। আরবি 'হা' অক্ষরের উপরে জবর আছে।

তিনি হাসলেন। বিভ্রান্ত হলাম আমি। 'স্যার হাসছেন কেন?'

বললেন, 'আমি তো নাম বাংলায় লিখছি।'

- তবুও। হ'তে আ-কার দিতে পারতেন।

এরপর তিনি যা শোনালেন, কিছু সময়ের জন্য আমাকে 'হা' করে তাকিয়ে থাকা ছাড়া উপায় ছিল না। তিনি বললেন, 'বাংলায় লিখলেও জের-জবর লাগাতে হবে?'

- জি।

- লাগাতেই হবে?

আমি তাঁর চেহারার দিকে তাকালাম। তিনি আবারও হাসলেন। আগের মতো রহস্যজনক হাসি। বললেন, 'আপনারা করলে ঠিক আর আমরা করলে ভুল?'

- বুঝলাম না স্যার!

- নবিজির নাম তো মুহাম্মাদ। মুহাম্মাদের হা'তে যেমন জবর আছে, 'মিমেও তো জবর আছে। তাহলে আপনিও তো বললেন, 'মুহাম্মদ'! তার মানে, মিমের জবর বা ম'র আ-কার আপনিও ছাড়লেন। আপনারা ম'র আ-কার ছাড়লে সমস্যা না হলে আমার হ'য়ে সমস্যা হবে কেন!!

কঠিন জবাব।

ডক্টর মুহম্মদ জাফর ইকবাল। সিলেট শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার সাইন্স অ্যান্ড টেকনোলজি বিভাগের বিভাগীয় প্রধান। বেশ কয়েকবার আমার সুযোগ হয়েছিল তাঁর সাথে সরাসরি বসার। একবার লেখক বশির আহমদ জুয়েলকে নিয়ে, আরেকবার ছড়াকার তাজুল ইসলাম বাঙালি ছিলেন। আজ শুধু প্রথম দিনের গল্প বলছি।

প্রথম মোলাকাত

আদর্শিক মেরুকরণে জাফর ইকবালের অবস্থান যদি হয় উত্তর মেরুতে, আমি আছি দক্ষিণ মেরুতে। তবে ব্যক্তি জাফর ইকবাল আমার পছন্দের একজন মানুষ। ভালোলাগে তাঁর আচারিক সারল্য। ২০০৬ সালে তাঁর সাথে আমার প্রথম সরাসরি দেখা। শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর ডিপার্টমেন্টে প্রথম সামনা-সামনি বসা, কথাবলা। আমার সাথে লেখক বশির আহমদ জুয়েল। আমি আমার সদ্য প্রকাশিত প্রথম বই *বিবেকের পিঠে...* গিফট করলাম তাঁকে। প্রতিভার সবটুকুন ঢেলে দিয়ে পুরো একপাতা জুড়ে আগেই অটোগ্রাফ লিখে নিয়ে গিয়েছিলাম। বইটি হাতে দিয়ে জিজ্ঞেস করেছিলাম, এর আগে এতবড় অটোগ্রাফ কেউ তাঁকে দিয়েছিল কি না! তাও স্বেচ্ছায় এবং ঘরে এনে! তিনি হাসতে হাসতে ডানে বামে মাথা দুলিয়েছিলেন। প্রায় একঘণ্টা সময় দিয়েছিলেন সেদিন। বিস্মিত হয়েছিলাম তাঁর আন্তরিকতায়। জীবনে প্রথম দেখা। তিনি একজন জনপ্রিয় মানুষ। আমি 'কোথাকার কেউ'-টাইপ একজন। তাও আবার উনার বিপরীত মেরুর। কিন্তু আচরণে একবারও সেটা বোঝা যাচ্ছিল না।

কথাবার্তার শুরুতে আমি তাঁকে বলেছিলাম, 'স্যার! একাত্তরের অনেক পরে আমার জন্ম বলে আমার পক্ষে যে রাজাকার হবার সম্ভাবনা নাই, কোনো কনফিউশন আছে?'

হাসতে হাসতে বলেছিলেন, 'আরে কী বলেন! ধর্মকর্ম করলেই কি রাজাকার হয়ে যায় নাকি! আমার মা তো নিয়মিত তাহাজ্জুদের নামাজও পড়েন। আমি হয়তো সময়ের অভাবে নামাজ-টামাজ পড়তে পারি না...'

পয়েন্ট টু বি নোটেড। **'আমি হয়তো সময়ের অভাবে নামাজ-টামাজ পড়তে পারি না।'** কথাটি আমি অনেক মাধ্যমে অনেকবার বলেছি। এই কথাটি সামনে এনে আমি বলবার চেষ্টা করেছি, জাফর ইকবালকে আর যা-ই বলা হোক; নাস্তিক বলার দরকার নেই। নাস্তিক হলে বলতেন, 'আমি নামাজ-টামাজ পড়ি না!' তিনি বললেন, 'পড়তে পারি না'। আর 'পারি না'-এর মাঝে যে 'পারা উচিত' বা স্বীকারোক্তি মিশে থাকে—এটা তো ব্যাখ্যা করে বোঝানোর কিছু নেই।

সেদিন কথায় কথায় আমি তাঁকে বলেছিলাম, 'স্যার! লেখালেখির জন্য কিছু টিপস দিন তো।'

বললেন, 'আস্ত একটা বই লিখে ফেলেছেন, টিপসের আর দরকার কী!'

বললাম, 'পাশ কাটিয়ে যাওয়া যাবে না স্যার।'

বললেন, 'কলমের পেছনে থাকবেন। কখনো কলমের সামনে যাবেন না।'

- মানে কী? স্যার!

- মানে হলো, যখন লিখবেন, শুধু মাথায় রাখবেন যা লিখেছি; সঠিক লিখছি কি না। বিবেকসিদ্ধ হচ্ছে কি না। ব্যস, আর কোনোদিকে তাকানো যাবে না। লিখতে গিয়ে যদি দেখা যায় নিজের কারও বিরুদ্ধে চলে যাচ্ছে, চলে যেতে দিতে হবে। কথা ঘোরানো যাবে না। আর বেশি বেশি পড়বেন। **যে যত ভালো পাঠক, সে তত বড় লেখক।**

সিঙারা দিয়ে লাল চা খাওয়ালেন। আমরা যখন ফিরছিলাম তখন... আগে বলা হয়নি; আমরা যখন গিয়েছিলাম, চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে হ্যান্ডশেইক করেছিলেন। বিস্মিত হয়েছিলাম তখন। অবস্থানগত বিবেচনায় আমাদের জন্য তাঁর দাঁড়ানোর কোনো কারণ ছিল না। কিন্তু তিনি দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি তাঁর শিষ্টাচার ও সামাজিকতার অ্যাঙ্গেল থেকেই সেটা করেছিলেন। যখন ফিরছিলাম আমরা; তিনি আবার উঠে দাঁড়ালেন। আমাদের সাথে হেঁটে হেঁটে দরজা পর্যন্ত এলেন বিদায় জানাতে।

ফেরার পথে বার বার একটি কথাই শুধু মাথায় ঘুরতে লাগল আমার।

বিদায়বেলা মেহমানকে কয়েক কদম এগিয়ে দেওয়া—এটা তো আমার নবির সুন্নাত। কিন্তু আমরা সেটা ছেড়ে দিয়েছি। ওদিকে আল্লাহপাক তাঁর নবির এই সুন্নাতকে অন্যদের মাধ্যমে জিন্দা রেখেছেন; এমনদের মাধ্যমে—যারা সুন্নতের দ্বারই ধারে না—ব্যাপারটিকে তাদের কালচারের অংশ বানিয়ে দিয়ে।

এই সেরেছে। ওলামা-হজরতগণ মনে মনে বলতে শুরু করেছেন, জাফর ইকবালের মতো মানুষ, যিনি প্রগতিশীলতার নামে আলেম-ওলামা, মসজিদ-মাদরাসা ইস্যুতে হর-হামেশা আক্রমণাত্মক, তাঁর গুণগান গাওয়া... মতলবটা কী!

মতলব পরিষ্কার। আমরা সাদাকে সাদা আর কালোকে কালোই বলব। যার যেটা প্রাপ্য, তাকে সেটা বুঝিয়ে দেবো। কারও মন্দ কথা-কাজের প্রতিবাদ করা আমাদের দায়িত্ব। ভালো'র প্রশংসা পাওয়া তাঁর অধিকার। জাফর ইকবাল কী ও কেন—সেটা নিয়ে কথা আছে। সেটা নিয়ে কথা হবে। তার মানে 'ভালো' কিছু হলেও কেন 'ভালো' বলা যাবে না!

ইনসাফের আদালতে কথা হবে মুন্সিফানা,
পৃথিবীর গতিপথ যোগ আর বিয়োগে।
শূন্য গুণন একশ' হলেও শূন্যই হয়,
ইনসাফ জিতে যাক, স্বরব্যঞ্জনের ব্যঞ্জনায়।

জাফরনামা

[স্যারের সাথে সরাসরি; এখানে বইয়ের পাতায়]

মাফ করবেন স্যার। আপনার থেকে শেখা সূত্রই অ্যাপ্লাই করতে যাচ্ছি এখন। আপনার সাথে অনেকেই গিয়ে দেখা করে। সুতরাং আমাকে আপনি আলাদা করে মনে রাখবেন; এটা ভাবছি না। তবে আপনাকে আমি সবসময় মনে রাখি। বিশেষত আপনার শেখানো সেই সূত্রটির কারণে। 'নীতির প্রশ্নে কাউকে ছাড় দিতে নেই।' কথাটি আপনি কতটুকু মানেন, আমার সন্দেহ আছে। তবে যে আমি মেনে লিখি—আপনার যেন সন্দেহ না থাকে।

আমি জানি এই লেখাটি আপনার কাছে পৌঁছাবে এবং আপনি স্বাভাবিকভাবেই নেবেন। আমি জানি এই মানসিকতা আপনার আছে। প্রমাণ পেয়েছি আমি। আমি ভুলে যাইনি আপনাকে সমালোচনা করে আমি আমার *প্রগতির দুর্গতি* বইয়ে কয়েক পাতা লিখেছিলাম। বইটি আপনি পড়েছিলেন। তারপর, কয়েকমাস পর *সিলেট সংস্কৃত কলেজ* মাঠের বইমেলায় *অন্য প্রকাশ*'র স্টলে এক সন্ধ্যায় আপনি ঘুরতে এলেন। স্টলের তত্ত্বাবধানে ছিল সিলেটের জসিম লাইব্রেরি। আমি তখন বাইরে ছিলাম। স্টলে আমারও বই ছিল। আপনার নজরে পড়েছিল। আপনি তখন জুয়েলকে বললেন, 'ও কোথায়'? সে বলল, 'পান খেতে বাইরে গেছে স্যার'। ফোন দিই? আপনি বললেন, 'না থাক। আমি চলে যাব এক্ষুণি'। তারপর আপনি একটি বই হাতে নিয়ে সেখানে লিখলেন, 'প্রিয় রশীদ জামীলকে শুভেচ্ছা'। বইটি জুয়েলের হাতে ধরিয়ে দিয়ে বললেন, 'ওকে দিয়ো'।

আমি অভিভূত হয়েছিলাম স্যার। আপনাকে সমালোচনা করে লেখার পরও আপনার আন্তরিক আচরণে কিছুটা বিস্মিতও হয়েছিলাম আমি। আর কেউ হলে ভাবত, কতবড় সাহস! চুনোপুটি হয়ে আমার বিরুদ্ধে লেখালেখি করে! এই ইনস্পায়ারেশন্স থেকেই লিখছি। সাথে ছিল আপনার বাতানো সূত্র, 'কলমের পেছনে থাকা, কাউকে ছাড় না দেওয়া'। শুরু করছি স্যার, আল্লাহর নাম নিয়ে।

চাপার জোরে ভাপা ভাজি

ডক্টর মুহম্মদ জাফর ইকবাল জনপ্রিয় একজন শিশুসাহিত্যিক। সাইন্স ফিকশনকে বাংলাদেশে জনপ্রিয় করার ক্ষেত্রেও তাঁর ভূমিকাকে প্রথম গণ্য করা হয়। যদিও দুষ্টজন বলে, উনার সাইন্স ফিকশনগুলো কোনো না কোনো বিদেশি বইয়ের ছায়া অবলম্বনে তৈরি। সেটা ভিন্ন কথা।

জাফর ইকবাল স্যার অত্যন্ত ঝানু মানুষ। যতই বলুন আমি একজন সাদাসিধে মানুষ। তিনি যে মোটেও সাদাসিধে নন; এ যাবতকার লেখায় সেটা বার বার প্রমাণ করেছেন। নিজেকে তিনি 'নাস্তিক' ঘোষণা করেছেন বলে আমি এখনো শুনিনি। তবে তাঁর লেখাজোখা নাস্তিকতাকেই প্রমোট করে। আর এজন্য সবচে মোক্ষম যে অস্ত্রটি তিনি অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার সাথে ব্যবহার করেন, সেটা হলো 'মুক্তিযুদ্ধ'। একাত্তরে তরুণ জাফর ইকবাল মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ না করে পালিয়ে বেড়ালেও তরুণ প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের কথা বলে ভালোই কব্জা করতে পেরেছেন তিনি।

জাফর ইকবাল তরুণ প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের গল্প শোনান। মুক্তিযুদ্ধের গল্প শোনাতে ভালোবাসেন তিনি। তিনি যখন মুক্তিযুদ্ধের গল্প লিখেন, তখন বর্ণনাভঙ্গি থাকে এমন যে, মনে হয় যেন কেঁদে ফেলবেন। অথচ, আমরা তাঁর নিজের লেখা থেকেই জেনেছি—একাত্তরে যুদ্ধে যাননি তিনি। পালিয়ে বেড়িয়েছেন এখান থেকে ওখানে, ওখান থেকে সেখানে। অথচ, তিনি তখন তাগড়া জোয়ান।

আমি বলছি না তিনি মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে ছিলেন। আমি এ কথাও বলতে চাইছি না তিনি স্বাধীনতা চাননি। আমি জানি তাঁর বাবা ফয়জুর রহমানকে পাক সেনারা গুলি করে হত্যা করেছিল। সব ঠিকাছে। তবুও একটা 'কিন্তু' থেকে যায়। সেই 'কিন্তু'টি নিয়ে কিঞ্চিত কথা বলি।

একাত্তর ছিল একটি অন্যরকম ভিন্ন কিছু। বাংলা মায়ের দামাল ছেলেরা লুঙ্গি কোমরে গুজে ছুটে বেরিয়েছিল রাইফেল হাতে। পেটে খাবার ছিল না তাদের। ছেলে কোথায়, মেয়ে কেমন আছে, স্ত্রী কোথায় থাকবে—কোনোদিকেই তাকায়নি তাঁরা। একটাই চাওয়া ছিল তাদের। দেশকে স্বাধীন করতে হবে; যে করেই হোক। পাক হানাদারদের তাড়াতে হবে; যেভাবেই হোক।

যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকেই শুরু হলো দৌড়। বাঙালি যুবকরা দৌড়ায় দেশ বাঁচাতে। তিনি দৌড়ান জান বাঁচাতে। আজ তিনি মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে বড় বড় কথা বলেন!

জাফর স্যারের মুরিদানদের কেউ যেন এই খোড়া যুক্তি দাঁড় করাবার চেষ্টা না করেন যে, 'পাক সেনারা জাফর ইকবালদের খোঁজছিল গুলি করার জন্য'। পাক সেনারা তখন মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের কোনো যুবককেই চুমো দেওয়ার জন্য খোঁজছিল না। তবুও ছেলেরা যুদ্ধে গিয়েছিল।

কেউ যেন বলবার চেষ্টা না করেন, 'তাঁর পরিবার তখন অসহায় ছিল। ভাইবোন নিয়ে তাদের অসহায় মা এখান থেকে ওখানে ছোটাছুটি করছিলেন'! একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে থাকা কোনো পরিবারই তখন শান্তিতে ছিল না। সবাই ছিল অসহায়। অবশ্য কিছু পরিবার শান্তিতে ছিল; কিন্তু তাদের কেউ দেশে ছিল না। তারা ছিল মাসীর দেশে। তাহলে পারিবারিক অসহায়ত্বের অজুহাত ধুপে টেকে না। আর এগুলো যদি গ্রহণযোগ্য কারণ হয়, তাহলে যারা যুদ্ধে গেল, তাদের কারোই যুদ্ধে যাওয়ার দরকার ছিল না। আর সবাই যদি পরবর্তীতে মুক্তিযুদ্ধের গল্প লেখার জন্য একাত্তরে পালিয়ে বেড়াত, তাহলে কি এখন এভাবে স্বাধীন দেশে বসে জাফর ইকবালদের *ভূতের বাচ্চা সোলায়মান* লেখবার সুযোগ তৈরি হতো!

সুতরাং

প্রিয় জাফর ইকবাল স্যার!

কিছু মনে করবেন না স্যার। একাত্তরে পলায়নের জন্য আমি আপনাকে বিনীত ধিক্কার জানাতে চাই। আর আপনাকে অনুরোধ করতে চাই, মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে মায়াকান্না করে ছোট ছোট বাচ্চাগুলোকে আর বিভ্রান্ত করবেন না। কোনো পলাতকের মুখে আমরা আমাদের গৌরবের ইতিহাসকে বিবৃত হতে দেখতে চাই না। প্লিজ, থামুন এবার। আপনার মুখে মুক্তিযুদ্ধের গল্প শোভা পায় না। আমরা বললে সেটা বরং যুৎসই লাগে। আমি যদি বলি, একাত্তরের আগে আমার জন্ম হলে আমি হতাম মুক্তিযোদ্ধা; পৃথিবীর কারও ক্ষমতা নেই আমাকে ভুল প্রমাণ করে।

আর যদি,

এতই যদি মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে গল্প করতে ভালো লাগে, তাহলে প্রতিটি গল্পের শুরুতে লিখে দিন, **'আই'ম সরি। আমি যুদ্ধে যাইনি। আমি ছিলাম পলাতক'**।

আংশিক নয়, পাঠকের অধিকার পুরোটা শোনা।

জাফর ইকবাল কি নাস্তিক

ডক্টর জাফর ইকবাল কি নাস্তিক?

তিনি কি আল্লাহ বা স্রষ্টার অস্তিত্বে অবিশ্বাসী?

জাফর ইকবালকে আমি নাস্তিক মনে করি না। এই না বলার পক্ষে অ্যাভিডেন্স আছে আমার কাছে। এখন বেজার হলেও কিচ্ছু করার নেই। আমি একই কথা বলব। কারণ—

১. আমার জ্ঞানত তিনি কখনো বলেননি 'আমি স্রষ্টা বলে কারও অস্তিত্ব বিশ্বাস করি না'।

২. তিনি তাঁর লেখায় ঈশ্বর শব্দটি ব্যবহার করেন। ঈশ্বর শব্দ আল্লাহ শব্দের প্রতিনিধিত্ব করে কি না—সেটা ভিন্ন বিষয়। কিন্তু ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন বলেই তো শব্দটি তিনি ব্যবহার করেন।

৩. তাকে শাবিপ্রবির শাহপরাণ হল মসজিদে জুমুআর নামাজেও দেখা গেছে। এমন তথ্য আমি শাবি ছাত্রদের থেকেই জানি।

৪. বড়ভাই হুমায়ূন আহমেদের জানাজার নামাজে জাফর ইকবালের অংশগ্রহণ সবাই দেখেছে। নাস্তিক কেউ কারও জানাজার নামাজে শরিক হবার কথা না।

৫. জানাজার পরে উপর দিকে হাত তুলে মুনাজাত করতেও তাকে দেখা গেছে। তাহলে তাকে নাস্তিক বলা যাবে কেমন করে!

৬. জাফর ইকবালের পুত্র নাবিল এবং কন্যা ইয়েশিমকে একসময়; ছোট ছিল যখন, দেশে ছিল যখন—বাসায় গিয়ে কুরআন পড়াতো আমাদের এক ছোটভাই হাফিজ শফিক। কোনো নাস্তিক কি সন্তানকে কুরআন পড়ায়? সুতরাং জাফর ইকবালকে কোনো যুক্তিতেই নাস্তিক বলার কারণ নেই।

তার মানে, এই অ্যাঙ্গেল থেকে আমি কি তাঁকে 'ধোয়া তুলসির পাতা' প্রমাণ করবার চেষ্টা করছি! আমি কি তবে বলবার চেষ্টা করছি জাফর ইকবাল একজন খাঁটি দীনদার এবং পরহেজগার লোক!

মোটেও না। আর তিনিও চান না কেউ তাঁকে খাঁটি মুসলমান বলুক। এই লাইনে তাঁর আলাদা কোনো ইনটেনশন নেই। তাহলে প্রগতির বাজারে দর পড়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে।

তাহলে কী?

জাফর ইকবাল কেমন?

'জাফর ইকবাল কেমন'—বলবার আগে নাস্তিক এবং নাস্তিকতা নিয়ে প্রাথমিক কিছু কথা বলা দরকার। এটা এজন্য দরকার যে, আমরা যেন শব্দটির প্রয়োগক্ষেত্র সম্বন্ধে নিশ্চিত ধারণা রাখি। অপপ্রয়োগ যেকোনো শব্দের উপযোগ কমিয়ে দেয়।

আমদের কিছু ভাই-বেরাদার নাস্তিক শব্দটির যত্রতত্র প্রয়োগ করে মূল নাস্তিকদের এক প্রকারের ছাড়পত্রই দিয়ে দিচ্ছেন। নাস্তিক বলতে অ্যান্টি-ধর্ম লোকজনকে মিন করছি। শুধু বাংলাদেশেই না, দক্ষিণ এশিয়ায় নাস্তিকতার মানেই হচ্ছে ধর্মের বিরুদ্ধে কাপড়খোলা সমালোচনা। আরও স্প্যাসিফিক করে বললে ইসলামের বিরুদ্ধে যে যত জঘন্য ভাষা প্রয়োগ করতে পারবে, সে তত বড় নাস্তিক। তখন তারা প্রগতিজীবীও।

ব্রেইনওয়াশ

জাফর স্যার সারাদেশে নিজস্ব কিছু শিষ্য তৈরি করে ফেলেছেন। না, আমি তাঁর পাঠক বা ভক্তকুলের কথা বলছি না। বলছি তাঁর নায়েবদের কথা। বলছি তাদের কথা, যাদের চিন্তায় তিনি তাঁর চেতনা ডাইভার্ট করে দিতে পেরেছেন। যারা এখন তাঁর মনের মতো করে কাজ করতে পারছে।

শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশের প্রধানতম বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়। কিন্তু আমরা কি জানি মাঝেমধ্যে ওখানে কী হয়? কেমন করে ব্রেইনওয়াশ করা হয় শাহজালালের সন্তানগুলোর? খোঁজ নিয়েছি কখনো? আমরা কি জানি শাবিতে কতো সূক্ষ্মভাবে ইসলামের বিরুদ্ধে কাজ করে যাওয়া হচ্ছে। ইসলাম সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণার কারণে হোক, প্রগতির মাতাল হাওয়ার কারণে হোক, অথবা আলেম সমাজের—দূরে থেকে সমালোচনা করা বা ফতওয়া দেওয়া; কিন্তু কাছে ডেকে বা কাছে যেয়ে বিভ্রান্তি দূর করার অনীহার কারণেই হোক, শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলাম-বিরোধী যে কাজগুলো হচ্ছে; সেটা কি বাইরে থেকে কল্পনাও করা যাবে? শাবিপ্রবিতে কীভাবে ছাত্র-ছাত্রীদের ব্রেইনওয়াশ করা হচ্ছে, ছোট্ট একটি উদাহরণ দিচ্ছি।

জনৈক লেকচারার ভার্সিটিতে ক্লাস নিচ্ছিলেন। কতো ক্রিটিক্যালভাবে কাজ করা হয়, সেটা বুঝবার জন্য ব্যাপারটি আলোচনায় আনতে চাইছি। ওই শিক্ষক আল্লাহ ও কুরআনের বিরুদ্ধে কিছুই বলেননি। তিনি বলেননি কুরআনে